হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার আদি-অন্ত
ড. আবদুল লতিফ মাসুম ১৫ জুন ২০২২, ২০:৪৪, আপডেট: ১৬ জুন ২০২২, ০৫:৫৭

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি আদি ইতিহাসের মতোই পুরনো। এর সূত্রপাত সিন্ধু নদের সভ্যতায়। বহিরাগত আর্যরা দেশজ দ্রাবিড়দের দক্ষিণে বিতাড়ন করে। বিস্ময়ের বিষয়, হাজার হাজার বছর আগের সেই সাম্প্রদায়িকতার রেশ এখনো বহমান ভারতে। উত্তর-দক্ষিণের রাজনৈতিক বিভাজন স্পষ্ট। অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য। সামাজিক ভেদাভেদ অনুরণিত। ভাষার ভেদাভেদ এতটাই তীব্র যে, হিন্দির প্রাধান্যে দক্ষিণ ভারত ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ। সেই সে অতীতে যে বর্ণবাদের সূচনা তা আজো হিন্দু সম্প্রদায়কে ক্ষত-বিক্ষত করছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্য ও শূদ্রর বিভাজন এতটাই তীব্র যে, প্রায়ই নিজেদের মধ্যে হামলা হাঙ্গামা নিত্য-নিয়ত। আজো তারা এক কুয়োর পানি খায় না।

তাদের কিতাবে আছে- কোনো শূদ্র যদি কোনো ব্রাহ্মণের ছায়ায় আসে তাহলে তাকে স্নান করে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। তাদের ধর্মগ্রন্থ কোনো শূদ্র যদি শ্রবণ করে বা পাঠ করে রৌরব নামক নরকে যাবে সে। এই মানসিক ও পারিপার্শ্বিক মনোভঙ্গি নিয়ে যখন বসবাস করছিল তারা তখন বিভাজন, শাসন ও ত্রাসন ছিল তীব্র। যখন অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মুসলমানরা সিন্ধু নদের অববাহিকা অতিক্রম করে ক্রমেই গঙ্গা, যমুনা, মেঘনা অতিক্রম করে তখন ইসলাম ও মুসলমানের সংস্পর্শে তাদের চির লালিত ভেদবুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটে। সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতির এক সম্পর্ক শত শত বছর ধরে বহমান থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীর সুলতানি শাসন থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী মোগল শাসনের অবসান পর্যন্ত বড় ধরনের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার উদাহরণ নেই। ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ডরূপে আবির্ভূত হয় তখন বিদেশীরা হিন্দুদের সতত সমর্থন পায়। এবার তাদের চিরকাল লালিত সাম্প্রদায়িকতা নবরূপে উত্থিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রবল উত্থান ঘটে। নামে সংস্কার হলেও আদতে তা ছিল মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ। ১৮৮৫ সালে আর্য সমাজ গঠিত হয়। এর স্লোগান ছিল 'ব্যাক টু দ্য বেদ'। তারা বলছিল হিন্দু ধর্ম মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের যৌথ আক্রমণের শিকার। শুদ্ধাচার সংস্কার শুরু হয়। এ সময় তিন জন বিখ্যাত ব্যক্তি- বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায় ও বিপিন বিহারি পাল গো-হত্যা নিবারণ আন্দোলন শুরু করেন। এরা হিন্দু পুনর্জাগরণের স্লোগান দিয়ে পুরনো অবলুপ্ত উৎসবগুলো পুনর্গঠন করেন। এই আন্দোলন গোটা ভারতে উগ্র মুসলিমবিরোধ উসকে দেয়। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের মাধ্যমে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের যে চেষ্টা শুরু হয় তা ভেস্তে যায়। স্যার সৈয়দ আহাম্মদ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী ও নওয়াব আবদুল লতিফ প্রমুখ নেতার কর্মকাণ্ডে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এর পরিণতিতে অর্থাৎ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার অনিবার্য পরিণতিতে ঢাকায় ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অপর দিকে মহাত্মা গান্ধী সনাতন ধর্মের নিষ্ঠাবান অনুসারী হয়েও উদারভাবে মুসলমানদের একীভূত করার প্রয়াস পান। এতে হিতে বিপরীত হয়। উগ্র হিন্দুরা কংগ্রেসে থেকে সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে। বল্লøভ ভাই প্যাটেল, কৃষ্ণমেনন, রাজা গোপালচারীর মতো উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারা মুসলিম স্বার্থবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেন। অপর দিকে, আরো উগ্র হিন্দুরা ১৯১৫ সালে হিন্দু মহাসভা গঠন করে। দুর্ভাগ্যের বিষয়- এর নেতৃত্ব দেন শিক্ষাবিদ খ্যাত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মুসলিমবিদ্বেষী সন্তান শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এর ১০ বছর পর ১৯২৫ সালে হিন্দু উগ্র আধ্যাত্মিকতাবাদের আদর্শ নিয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রীয় সেবক সঙ্ঘ- আরএসএস। এরা প্রথম দিকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও পরবর্তীকালে উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। মহাত্মা গান্ধীর খুনি নাথুরাম গডসে আরএসএসের সসস্য ছিল। মহাত্মা গান্ধীকে প্রাণ দিতে হয় পাকিস্তান তথা মুসলমানদের জন্য সহানুভূতিমূলক আহ্বানের কারণে। পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার মৃত্যুতে বলেছিলেন ভারত এক মহান হিন্দুকে হারাল।

১৯৪৭ সালে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা পরিণতিতে ভারত বিভক্ত হলেও বন্ধ হয়নি চরম হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা। জওয়াহের লাল নেহরুর নমনীয়তা সত্যেও মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িকতা দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। কংগ্রেস দৃশ্যত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী কর্মসূচি নিলেও অদৃশ্যভাবে মুসলিম স্বার্থবিরোধী কার্যক্রম অনুমোদন করে। যেমন ভারতের উত্তর অংশে হিন্দিকে প্রাধান্য দেয়া এবং গো-হত্যা নিরুৎসাহিত করা। দীর্ঘকাল কংগ্রেস শাসনে অসন্তুষ্ট জনগণ বিকল্প সন্ধান করে। তাদের ভাষায় মুসলিমরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সুবিধা বেশি ভোগ করছে। তাই এর বিপরীতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কংগ্রেস এবং বিরোধী দলগুলো হিন্দু জাতীয়তাবাদ তোষণের নীতি নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। একসময় পরস্পরবিরোধী আদর্শে দীক্ষিত অথচ কংগ্রেস বিরোধিতায় একমত দলগুলো দৃশ্যত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার নীতিকে ক্ষমতার রদবদলের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আঞ্চলিক, নৃতাত্ত্বি¡ক ও ধর্মীয় পরিচয়ে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ লক্ষ করা যায়।

উদাহরণ হিসেবে ১৯৬৮ সালে শিবাজির জন্মদিনে বালঠাকরে নামক এক নেতার নেতৃত্বে মারাঠা জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক 'শিব সেনা' গঠিত হয়। এই দলের প্রেরণার উৎস হলেন মোগল শাসনের শেষ দিকে মারাঠা শক্তির ঐক্যবদ্ধ উত্থানে বিশ্বাসী শিবাজি। দলটি মূলত মুসলিমবিরোধী ও কমিউনিস্টবিদ্বেষী। ১৯৬৮ সালে তারা মুম্বাই পৌরসভার বেশির ভাগ আসনে জয়লাভ করে এবং মেয়র পদে নির্বাচিত হয়। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিভিন্ন দলের সাথে মোর্চা করে শিব সেনা বিভিন্ন রাজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে। দলটি খোলাখুলি মুসলিমবিরোধী ক্রিয়াকলাপে ইন্ধন জোগায়। ১৯৯৩ সালে শিব সেনা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে। ১৯৯৫ সালে মহারাষ্ট্রে শিব সেনা নেতা মনোহর যুশির মুখ্যমন্ত্রিত্বে প্রাদেশিক সরকার গঠিত হয়। ভারতে সাম্প্রদায়িক শক্তির আরেকটি বড় অধ্যায় আরএসএসকে কেন্দ্র করে। এ সংগঠনের মূল নেতা হলেন ভি ডি সাভারকর। তিনি হিন্দু জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রিক, ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতার কথা বলেন।

এসব ধর্মীয় আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ফলাফল জাতীয়ভাবে অনুভূত হয়। ১৯৮০ সালে গঠিত হয় ভারতীয় জনতা পার্টি। এই দল গঠনে বিপরীত আদর্শ ও ক্ষমতা দখলে তথা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসকে হটানোর তাগিদ অনুভূত হয়। নতুন সংগঠিত দলটি প্রাথমিকভাবে সারা ভারতে বিশেষত গ্রাম দেশে ধর্মীয় ভাবাবেগ তৈরিতে সক্ষম হয়। এই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পেছনে ভারতীয় জাতীয় টেলিভিশনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। হিন্দুদের দু'টি প্রধান ধর্মগ্রন্থ মহাভারত ও রামায়ণ অবলম্বনে ধারাবাহিক নাটক প্রদর্শিত হয়। পরবর্তী সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায়, এই দু'টি সিরিয়াল ভারতীয় জনগণের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। প্রকারান্তরে এটি মুসলিমবিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে। ১৯৮৯ সালে এসব ঘটনার ফলে বিজেপি বিরাট নির্বাচনী সাফল্য লাভ করে। এ সাফল্যে তারা

বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এই সময়ে ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের সব শক্তি একত্রিত হয়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের চরম পরাকাষ্ঠার প্রমাণ এটি।

তৎকালীন কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে বাজপেয়ি বিজেপি কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এ সময় এই সরকারের সিদ্ধান্তে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই বিস্ফোরণ গোটা বিশ্বে ভারতের সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রতিষ্ঠায় ভালো ভূমিকা রাখে। পরবর্তীকালে জানা যায়, পাকিস্তান তাৎক্ষণিকভাবে পারমাণবিক বিস্ফোরণ না ঘটালে আরেকবার ভারতীয় আগ্রাসনের শিকার হতো। প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক সরকার কাশ্মিরের ব্যাপারে মারাত্মক নির্যাতনমূলক নীতি গ্রহণ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যক্ত হয়। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার আদলে পাঠ্যবই পুনর্লিখিত হয়। ২০০২ সালে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাবরি মসজিদের স্থানে মন্দির নির্মাণের আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে নির্মম দাঙ্গাটি অনুষ্ঠিত হয় গুজরাটে। আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ভারতীয় কেন্দ্রীয় প্রশাসন, গণমাধ্যম এই হত্যার জন্য নরেন্দ্র মোদিকে দায়ী করে। আন্তর্জাতিকভাবে বিষয়টি এতই নিন্দিত হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নরেন্দ্র মোদির আমেরিকা প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। ইতিহাসের দুর্ভাগ্য এই যে, তিনিই এখন ভারতের ভাগ্যবিধাতা। আরো দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, এখন খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সাথে কৌশলগত সম্পর্কে আবদ্ধ। নির্মম রসিকতার ব্যাপার এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের অব্যাহত মুসলিম নিপীড়ন নীতির নিন্দা করেছে।

২০১৪ সাল থেকে সেই বিজেপি, সেই নরেন্দ্র মোদির নিরঙ্কুশ নেতৃত্বে ভারতের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। তেঁতুলগাছ লাগিয়ে কেউ যদি মিষ্টি আম খাওয়ার আশা পোষণ করে, তা যেমন বৃথা ঠিক তেমনি ভারতীয় ক্ষমতাসীন শাসকদের কাছে মানবাধিকার বা মুসলিম নির্যাতনের অবসান কামনা নিরর্থক। ২০১৪ সালের মে মাসে পার্লামেন্টে উদ্বোধনী ভাষণে নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, 'হ্যা মে ইন বারোসো সাল কি গোলামি সে নিকাল না হায়'। অর্থাৎ ১২শ' বছরের গোলামি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সাধারণত ব্রিটিশ শাসনের ২০০ বছরকে গোলামির কাল বলা হয়। মোদি মুসলিম শাসনামলকেও যখন গোলামির কাল বলেন তখন নূপুর শার্মা এবং নবীন কুমার জিন্দাল থেকে ভিন্নতর কিছু কি আশা করা যায়?

মোদির আমল মুসলিম নির্যাতনের ক্ষেত্রে সমস্ত সময় ও কালকে অতিক্রম করেছে। মূলত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপির রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। নরেন্দ্র মোদির মুসলিমবিদ্বেষী কার্যক্রম নিয়ে মহাকাব্য রচনা করা যায়। হজরত মুহাম্মদ সা:-এর অবমাননাই শুধু নয়, তারা পবিত্র কুরআন পরিবর্তনের চক্রান্ত করছে। জ্ঞানপাপী মসজিদ-আগ্রার তাজমহল, দিল্লির কুতুব মিনার- সর্বত্র মন্দির খোঁজার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে দু'টি আইন করা হয়েছে। একটিতে প্রতিবেশী দেশ থেকে মুসলমানদের ভারতে নাগরিকত্ব গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেবল হিন্দুদের আশ্রয় ও নাগরিকত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আরেকটি আইনে ভারতে অবস্থানরত মুসলমানদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়ার জন্য পাঁয়তারা করছে। আসামে ২০ লাখ মানুষকে বাংলাদেশী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। নরেন্দ্র মোদির সবচেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে কাশ্মিরের স্বায়ত্তশাসনবিষয়ক সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল। মুসলমানদের শরিয়াহ আইন বাতিল করা হয়েছে। ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড প্রবর্তন করা হয়েছে। দেওবন্দ মাদরাসার ফতোয়ার ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। গো-মাংস রাখার কথিত অপরাধে প্রতিনিয়ত পিটিয়ে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। জোরপূর্বক 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করা হচ্ছে। বুলডোজার দিয়ে মুসলমানদের বাড়িঘর ধ্বংস করা হচ্ছে। উন্মুক্ত স্থানে নামাজ পড়া কঠিন হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে মসজিদে মাইকে আজান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আসামে মাদরাসার অনুদান বন্ধ রয়েছে। সারা ভারতে ইসলাম, মুসলমান ও মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী নামগুলো পরিবর্তন করা হয়েছে। এমনকি মোগল সরাইয়ের মতো বংশধারার নাম পরিবর্তন করে হিন্দু নাম রাখা হয়েছে। মুসলিমবিদ্বেষের যে বীজ তারা এত দিন ধরে লালন করেছে তা এখন বিষবৃক্ষে রূপ নিয়েছে। এই বিষবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ও ফলমূল ক্রমেই ভারতকে গ্রাস করছে। আর নরেন্দ্র মোদির সাধের রাজত্বেরও অবসান ঘটাবে আগামী নির্বাচনে। এই আশাবাদ বিশ্বের বিবেকসম্পন্ন মানুষের। মানবেন্দ্র নাথ রায় প্রমুখ দার্শনিকরা মন্তব্য করেছিলেন- ভারতে একটি রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রয়োজন। যার মূল কথা হলো- মানুষই সব কিছুর মানদণ্ড। ধর্মতন্ত্রের পরিবর্তে চাই যুক্তিবোধ, নৈতিকতা ও ইহজাগতিক জীবনবোধের সঞ্চার। এর ফলে সাম্প্রদায়িক সামস্যার স্থায়ী ও মৌল সমাধান ঘটবে। নরেন্দ্র মোদিরা এসব মহৎ মানুষের আহ্বান শুনবে কি! নাকি ক্ষমতা এবং ক্ষমতার দাপটে ছারখার হয়ে যাবে।

এতক্ষণ মহাভারতের কথা শুনলেন। অবিভক্ত বঙ্গ, বাংলাদেশ তথা ভারতের পূর্বাঞ্চলের ইতিহাস বলা হয়নি একটুও। কী করে ১৯০৫ সালে বঙ্গমাতার অঙ্গছেদন সহ্য করা হয়নি, আবার সেই একই ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ১৯৪৭ সালে বঙ্গমাতার অঙ্গছেদন অনিবার্য করে তুলেছিল- তা এক করুণ ইতিহাস। এখানে এই কলেবরে তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তাই পাঠককুলের কাছে বিনীত নিবেদন পড়ে দেখুন এই বইটি : জয়া চ্যাটার্জি, বাঙলা ভাগ হলো : হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ : ১৯৩২-১৯৪৭। প্রকাশক ইউপিএল। পঞ্চম প্রকাশকাল-২০১৯। 'বেঙ্গল ডিভাইডেড' বইয়ের বঙ্গানুবাদ এটি।

ভারতের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি জটিল, কুটিল এবং হাজার বছর ধরে লালিত মজ্জাগত ব্যাধি। এটি পৃথিবীর অন্যত্র ঘটা সাম্প্রদায়িকতা থেকে ভিন্ন কিছু। সে দিক থেকে এটিকে ইউনিকও বলা যায়। মার্কসবাদীরা 'অর্থনৈতিক নির্ধারণ বাদে' যা নির্ধারণ করতে চান তা এখানে কার্যকর নয়। জওয়াহের লাল নেহরুর মতো নেতাদের অভিমত ছিল এটি ইংরেজ শাসকদের ভেদ নীতির পরিণাম। ইংরেজ চলে যাওয়ার ৭৫ বছর পর যখন ভারত সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছাদিত, সে যুক্তি আর খাটে কি! যে ধর্ম মানুষকে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করে সেই ধর্ম ভারতে অধর্মের কারণ ঘটাচ্ছে। অথচ ইসলাম এই সাম্প্রদায়িকতা অনুমোদন করে না। সূরা আল আন-আমের ১০৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- 'আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা (মূর্তিপূজক) ডাকে, তাদের তোমরা গালি দিও না। তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দেবে।' আর আবু দাউদ শরিফের একটি হাদিস, সাম্প্রদায়িকতার নামে যারা বিশৃঙ্খলা করে তাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে হজরত মুহাম্মদ সা: বলেন, 'যারা মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ডাকে, যারা সাম্প্রদায়িকতার জন্য যুদ্ধ করে এবং সাম্প্রদায়িকতার জন্য জীবন উৎসর্গ করে তারা আমাদের সমাজভুক্ত নয়।'

লেখক : অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Mal55ju@yahoo.com